দ্বাদশ অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়ন

বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব নতুন মাত্রা লাভ করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নও তাই বর্তমান সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সরকার আর্থ সামাজিক খাতে ২২.০৯ শতাংশ হারে বাজেট বরাদ্দ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন-শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করেছে। শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১.০৯ শতাংশ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৬৪.১৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সরকারের নেয়া অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এ সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ দুবার জাতিসংঘ সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড লাভ করে। দেশে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে সরকার স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে কাজ করছে। নারীর কাঙ্ক্ষিত বিকাশ এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে গৃহীত হয়েছে 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০'। শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে 'জাতীয় শিশু নীতিমালা-২০১১' এবং 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭'। এছাড়া, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, 'Human Development Report-2018' অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৬তম।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা আবশ্যক। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৫৮.৭ শতাংশই কর্মক্ষম। বিপুল কর্মক্ষম এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে জনভিত্তিক লভ্যাংশ আহরণে বাংলাদেশ সরকার নানা উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, 'Human Development Report-2018' অনুযায়ী ২০১৮ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৬তম। মানব উন্নয়ন সূচকের হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা (৭৬), ভারত (১৩০), ভূটান (১৩৪), নেপাল (১৪৯) এবং পাকিস্তান (১৫০)-এ অবস্থান করছে। বিগত কয়েক বছর থেকে মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের চিত্র সারণি ১২.১ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১২.১ঃ মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ

বৎসর	২০০০	২০১০	২০১২	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
সূচকের মান	০.৪৬৮	০.৫৪৫	০.৫৬৬	০.৫৮৩	০.৫৯২	০.৫৯৭	০.৬০৮

উৎসঃ Human Development Report-2018. UNDP

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতসহ সামাজিক খাতসমূহে অধিক বিনিয়োগ অপরিহার্য। এ কারণেই সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহের যথা: শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও

কর্মসংস্থান খাতের বাজেট বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। চলমান ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে জড়িত এসব খাতসমূহে মোট বাজেটের প্রায় ২২.০৯ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে বিবেচনা করা হয়। তাই জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে সরকার প্রতিবছর পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করছে। চলতি অর্থবছরে এ দুই খাতে মোট ৭৬,৪৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৬.৪৫ শতাংশ। এর ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ফলশ্রুতিতে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়া, প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও এইডস এর বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নও মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ফলে এসব খাতেও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লেখচিত্র ১২.১ঃ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের গতিধারা

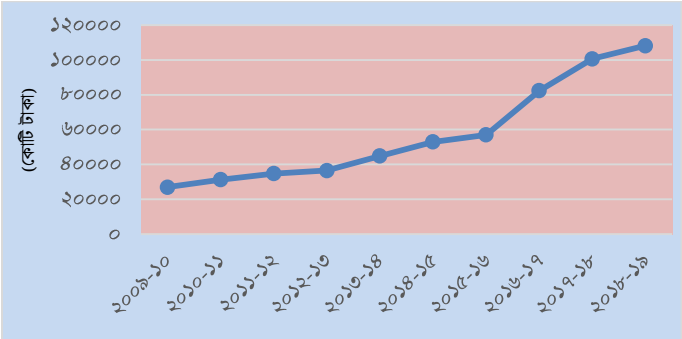

২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে পরিচালন এবং উন্নয়ন বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে লেখচিত্র ১২.১ ও সারণি ১২.২-এ দেখানো হলো। লক্ষ্যণীয় যে, এ খাতে গত এক দশকে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে।

উৎস: তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক।

সারণি ১২.২ঃ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের (পরিচালন ও উন্নয়ন) বিবরণ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৬১৭১	১৮৫৭৫	২০৩১৬	২১৫৬১	২৮২৭২	৩৩৪৯৯	৩৪৩৭০	৫২৯১৪	৬৫৪৪৪	৬৭৯৩৫
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৬৮৩৩	৭৬১৭	৮৮৬৯	৯১৩০	৯৯৫৫	১১৫৩৭	১২৬৯৫	১৭৪৮৬	২০৬৫২	২৩৩৮৩
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	৫৩০	৯১১	৯২৪	৯৭৬	১০৬১	১০৬৮	১১৯৯	১৩৪৩	১৮০৩	২০০৮
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৬৯	৬৭	৮২	১৩৪	১৯২	২২৬	৩০২	৩০৮	২৬২	২২৭
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	২৮১২	৩৪৯৯	৩৯৬৭	৪০৯১	৪৭৩০	৫৯৬২	৭৬১৩	৯৪৩৩	১১৩৯৪	১৩৩৪৩
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	৪৬৫	৫৪৯	৫৬০	৫৮৩	৬৩৩	৬৮৪	৭৭৯	৮৪০	১১৫০	১৩০৯
মোট বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**২৬৮৮০**	**৩১২১৮**	**৩৪৭১৮**	**৩৬৪৭৫**	**৪৪৮৪৩**	**৫২৯৭৬**	**৫৬৯৫৮**	**৮২৩২৪**	**১০০৭০৫**	**১০৮২০৫**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।*তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক।

শিক্ষা ও প্রযুক্তি

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম একটি সুশিক্ষিত, আত্মপ্রত্যয়ী ও বিজ্ঞানমনস্ক জনগোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। 'রূপকল্প ২০২১' এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণীত হয়েছে। এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

বাংলাদেশের সংবিধান নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত জাতি,বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান নিশ্চিতকরণের অধিকার দিয়েছে। সে প্রেক্ষিতে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে মোট ২২,৪৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর ৪নং লক্ষ্যমাত্রায় 'সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টির' কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকার উপবৃত্তি প্রকল্প, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪), রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প, দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, চাহিদাভিত্তিক সরকারি ও নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এবং মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) সহ আরো কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। বর্তমানে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ১,৩৪,১৪৭ টি (ব্র্যাক সেন্টার, রস্ক সেন্টার, বিভিন্ন এনজিও স্কুল, শিশু কল্যাণ ও মাদ্রাসা/মসজিদ ভিত্তিক কেন্দ্র/কওমী মাদ্রাসাসহ মোট ২৫ ধরনের বিদ্যালয়)। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ছাত্রের চেয়ে ছাত্রী ভর্তির হার বেশী। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫:৪৫। বর্তমানে তা ৪৯.২৫:৫০.৭৫-এ উন্নীত হয়েছে। ২০০৬-২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার সারণী ১২.৩ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৩ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

(লক্ষ)

বছর	মোট	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)	নীট ভর্তির হার (%)
২০০৬	১৬৩.৮৬	৮১.২৯ (৪৯.৬২)	৮২.৫৬ (৫০.৩৮)	৯০.৯
২০০৭	১৬৩.১৩	৮০.৩৫ (৪৯.২৬)	৮২.৭৮ (৫০.৭৪)	৯১.১
২০০৮	১৬৭.৪৯	৮৩.২৫ (৪৯.৭০)	৮৪.২৪ (৫০.৩০)	৯০.৮
২০০৯	১৬৫.৩৯	৮২.৪১ (৪৯.৮৩)	৮২.৯৮ (৫০.১৭)	৯৩.৯
২০১০	১৬৯.৫৮	৮৩.৯৫ (৪৯.৫০)	৮৫.৬৩ (৫০.৫০)	৯৪.৮
২০১১	১৮৪.৩২	৯১.৩৯ (৪৯.৬০)	৯২.৯৩ (৫০.৪০)	৯৪.৯
২০১২	১৯০.০৩	৯৪.৬৩ (৪৯.৮০)	৯৫.৪০ (৫০.২০)	৯৬.৭
২০১৩	১৯৫.৮৫	৯৭.৮১ (৪৯.৯৪)	৯৮.০৪ (৫০.০৬)	৯৭.৩
২০১৪	১৯৫.৫৩	৯৬.৩৯ (৪৯.৩০)	৯৯.১৪ (৫০.৭০)	৯৭.৭
২০১৫	১৯০.৬৮	৯৩.৬৯ (৪৯.১৪)	৯৬.৯৯ (৫০.৮৬)	৯৭.৯
২০১৬	১৮৬.০৩	৯২.২৮ (৪৯.৬০)	৯৬.৭৫ (৫০.৪০)	৯৭.৯
২০১৭	১৭২.৫১	৮৫.০৮ (৪৯.৩০)	৮৭.৪৭ (৫০.৬৮)	৯৭.৯৭
২০১৮	১৭৩.৩৮	৮৫.৩৯ (৪৯.২৫)	৮৭.৯৯ (৫০.৭৫)	৯৭.৮৫

উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

আর্থ-সামাজিক নানাবিধ কারণে অনেক শিক্ষার্থীই প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করতে দেখা যায়। সরকারের নেয়া নানা বাস্তবমুখী কর্মসূচির ফলে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ১২.৪-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৪ঃ বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার

বছর	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
মোট ঝরে পড়ার হার (%)	৪৫.১	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯	২০.৪	১৯.২	১৮.৮	১৮.৬

উৎসঃ Annual Primary School Census–2018, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ‘৪র্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)’ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ এবং স্কুল সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধির বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে ।
- বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত ৬০:৪০ অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত হলো ৬৪.১৮:৩৫.৮২ ।
- প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) ও উপজেলা এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আরও গতিশীল, কার্যকর ও কর্মমুখী করার প্রয়াসে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি অনুমোদন এবং ‘উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪’ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- উপবৃত্তি এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি করা হয়েছে। একইসাথে সুবিধাভোগীর সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে মোট ১.৪ কোটি শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
- ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে ধরে রাখার লক্ষ্যে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ১০৪টি উপজেলার ২৯.৪২ লক্ষ শিশুদের স্কুল খোলার দিন জনপ্রতি ৭৫ গ্রাম ফর্টিফাইড বিস্কুট বিতরণের কার্যক্রম চলমান আছে।
- বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং ঝরে পড়া ৮-১৪ বছর বয়সী প্রায় ১০ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পিইডিপি-৪ এর আওতায় ‘সেকেন্ড চান্স এডুকেশন’ প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হয়েছে।
- ‘প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৪,’ পিটিআই বিহীন নির্বাচিত ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন, ‘চাহিদাভিত্তিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)’ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও দেশের সকল উপজেলাসমূহকে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ‘মৌলিক সাক্ষরতা (৬৪ জেলা)’ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।
- ২৬,১৯৩টি রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং এসব বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের সরকারিকরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ২৬,১৮৫টি বিদ্যালয় জাতীয়করণের সরকারী আদেশ জারি করা হয়েছে। জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে প্রধান শিক্ষকসহ ৫টি করে পদ সৃজন করা হয়েছে। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিবেচনায় আরও ২১১টি বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে।
- ‘জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০’ অনুসরণে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত উন্নীতকরণের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৭৬৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেনী খোলা হয়েছে।

প্রাথমিক অবকাঠামো সুবিধাদি

প্রাথমিক শিক্ষার গুনগতমান উন্নয়নে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারী ২০১৯ পর্যন্ত নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছেঃ

- পিটিআইবিহীন নির্বাচিত ১২টি জেলা সদরে পিটিআই এর মধ্যে ১২টি পিটিআই স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- চাহিদাভিত্তিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ৮,১৫০টি বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ২৪৩টি বিদ্যালয় নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর আওতায় চলতি অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৬,৭১৭টি বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ৭৭টি বিদ্যালয় নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

সমাপনী পরীক্ষা ও বৃত্তি প্রদান

২০০৯ সাল থেকে সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১৮ সালের পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় প্রায় ২৬.৫২ লক্ষ পরীক্ষার্থী অংশ নেয় এবং ৯৭.৫৯ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাশ করে। অন্যদিকে, এবতেদায়ী মাদ্রাসা সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২.৭৪ লক্ষ এবং এ পরীক্ষায় ৯৭.৬৯ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাশ করে।

বর্তমানে পৃথকভাবে বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ না করে সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বৃত্তির সংখ্যাও প্রতিবছর বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ২০১৮ সালে মোট ৮২,৫০০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয় এর মধ্যে ট্যালেন্টপুল প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৩,০০০ সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে মোট ৪৯,৫০০ শিক্ষার্থী।

এছাড়াও, দেশের শ্রমজীবী শিশুদের জন্য শহর, নগরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শ্রমজীবী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখার জন্য শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট্রের মাধ্যমে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি

দরিদ্র পরিবারের পিতা-মাতাগণ তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে উপার্জনের জন্য বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে অথবা পিতা-মাতার পেশায় সহযোগী হিসেবে নিয়োজিত রাখে। বহু শিশু প্রাথমিক শিক্ষার পাঁচ বছর মেয়াদী চক্র শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে । এ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৬,৯২৩.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি' ৩য় পর্যায়-প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সারা দেশে মোট ১.৪ কোটি শিক্ষার্থীকে প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। ১ম-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত এই বৃত্তির হার এক, দুই, তিন ও চার সন্তানের জন্য যথাক্রমে ১০০ টাকা, ২০০টাকা, ২৫০ টাকা এবং ৩০০ টাকা। অন্যদিকে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এক সন্তানের জন্য ১২৫ টাকা, দুই সন্তানের জন্য ২৫০ টাকা, তিন সন্তানের জন্য ৩৫০ টাকা এবং চার সন্তানের জন্য মাসিক ৪০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

প্রতিবছর সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করছে। বছরের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্য বই তুলে দেয়া হচ্ছে। ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ১০.২৫ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৯ সালে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য মোট ৩৪.২৮ লক্ষ বই এবং প্রায় ৩৪.২৮ লক্ষ আনুষঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। বইয়ের প্রতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষনের জন্য চার রংয়ের নতুন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০১৯ সালেই প্রথম প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে সারা দেশে ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাদরী) শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩৪ হাজার বই, সমসংখ্যক অনুশীলন খাতা এবং ১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য প্রায় ২.০৭ লক্ষ বই বিতরণ করা হয়েছে।

সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধি

ইতঃপূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য বাৎসরিক সংযোগ সময় ছিল ৫৯৫ ঘণ্টা এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির জন্য ছিল ৮৩৩ ঘণ্টা । পরবর্তীতে প্রায় ৪,০০০ দুই শিফটের বিদ্যালয়কে এক শিফটে রুপান্তরিত করা হয়। এর ফলে এক শিফটের বিদ্যালয়ে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণিতে বার্ষিক সংযোগ সময় বৃদ্ধি পেয়ে ৯১৯ ঘণ্টা এবং তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণির ক্ষেত্রে ১,৪২৮ ঘণ্টা হয়েছে। দুই শিফটের বিদ্যালয়ে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণি এবং তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণির ক্ষেত্রে বার্ষিক সংযোগ সময় যথাক্রমে ৬০০ ঘণ্টা এবং ৭৮৯ ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগ

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ও সৃষ্টপদে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ৬০ শতাংশ শিক্ষিকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষিকা ও শিক্ষকের আনুপাতিক হার প্রায় ৬৪.১৮ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে

৯,৭৬৭ জন সহকারী শিক্ষক এবং পিএসসি সুপারিশকৃত ৩২৫ জন নন-ক্যাডার প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। আরো প্রায় ১০,০০০ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিদ্যালয় বহির্ভূত ও কর্মজীবী শিশুদের জন্য কার্যক্রম

স্কুল বহির্ভূত, ঝরে পড়া এবং শহরের কর্মজীবী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে পড়া দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (২য় পর্যায়)' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । দেশের ১৪৮টি উপজেলায় ২১,৩৬১টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭.২০ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত কিংবা ঝরে পড়া শিশুরা ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাবে। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত মাথাপিছু ৮০ টাকা হারে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত জনপ্রতি ১০০ টাকা হারে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, ইউনিফর্ম বাবদ বছরে জনপ্রতি ৪০০ টাকা প্রদান করা হচ্ছে। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা উপকরণ বাবদ প্রতিবছর ২০০ টাকা এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ বাবদ প্রতিবছর ৩০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ১,০০০ টাকা এবং ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার জন্য ভর্তিকৃত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হতে ভর্তি সনদ প্রদর্শন সাপেক্ষে ২,০০০ টাকা সহায়তা দেয়া হয়। ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ৩,৫৮৬ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৮৩,০০০ শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে। এছাড়াও, ঝরে পড়া ও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, দেশের ৬৪টি জেলার ২৫০টি উপজেলায় মৌলিক সাক্ষরতা নামক আরেকটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় দেশের ১৫-৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর কিশোর ও বয়স্কদের মৌলিক শিক্ষা ও জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

সকলের জন্য সমন্বিত ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী সুশিক্ষিত, আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদ গড়ে তুলতে সরকার বিগত মেয়াদে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়ন করেছে। এ শিক্ষানীতির অনুসরণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বদেশ প্রেম, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ তৈরির জন্য ধর্ম এবং নৈতিক শিক্ষা, দুর্নীতি, জঙ্গীবাদ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি, এইডস ও এইচ.আই.ভি, অটিজম, মানবাধিকার, নারী ও শিশু পাচার, আইসিটি ইত্যাদি বিষয়াদি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবার শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষাকে মানসম্মত, সর্বব্যাপী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বিনামুল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হচ্ছে। বছরের প্রথম দিন পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস উদযাপন করা হয়। এ দিন সমগ্র বাংলাদেশে একযোগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ৩৫,২১,৯৭,৮৮২ পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে সর্বপ্রথম বিনামূল্যে ব্রেইল পদ্ধতির পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে মোট ৭৫০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে মোট ৫,৮৫৭ টি ব্রেইল পদ্ধতির পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাঁচটি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, সাদরি, ত্রিপুরা ও গারো) ৯৮,১৪৪ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ২,৭৬,৭৮৪টি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

নারী শিক্ষা বিস্তার এবং ঝরে পড়া রোধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে সভা সমাবেশ, সচেতনতামূলক কর্মশালা এবং মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়ে থাকে। মাউশি'র মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য বাস্তবায়নাধীন 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)' এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে ১০০টি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ কাজ চলছে। 'সেকেন্ডারি এডুকেশন এন্ড অ্যাকসেস এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)' প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ক্লাস (ইংরেজি, গণিত এবং বিজ্ঞান) গ্রহণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

'ঢাকা মহানগরীতে ৬টি কলেজ ও ১১টি হাই স্কুল স্থাপন' প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। 'সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন' প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৪টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ শেষ হয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এস.ই.এস.ডি.পি.)-এর আওতায় সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় ৬২টি মডেল বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

২০০৯ সাল থেকে শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সারাদেশে ১,৬২৪টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এম.পি.ও. ভুক্ত করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট স্বীকৃতেপ্রাপ্ত নন-এম.পি.ও. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এম.পি.ও ভুক্ত করার লক্ষ্যে 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) এর জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮' জারি করা হয়েছে। বর্তমানে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এম.পি.ও. ভুক্ত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে দেশের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এ লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে গত ১০ বছরে ভর্তির হারে অভুতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০১৮ সালে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার শতকরা ১৫.১২ শতাংশ। সে ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট শতকরা ২০ ভাগে উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/প্রোগ্রাম নেয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (এনটিভিকিউএফ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। SDG ও ৭ম পঞ্চ-বার্ষিক এর সাথে সমন্বয় করে সমন্বিত TVET Action Plan তৈরি করা হয়েছে। অস্বচ্ছল পরিবারের তরুণ-তরুণীদেরকে আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী ও দেশে-বিদেশে চাকুরীর বাজার চাহিদার ভিত্তিতে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য যুগোপযোগী ট্রেড ও টেকনোলজি কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মোট ৮,৮৫২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে সরকারি ১১৯টি এবং বেসরকারি ৮,৭৩৩টি। এছাড়া, কারিগরি ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, সিলেট ও বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স এবং কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের ৮টি বিভাগীয় সদরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও, ২৩টি জেলায় একটি করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নির্মাণের জন্য পৃথক প্রকল্প সরকার অনুমোদন করেছে। এছাড়া, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ হিসেবে ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি, উপজেলা লেভেলে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন (২য় পর্যায়), কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ উপবৃত্তি প্রকল্প, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন, কক্সবাজার টিএসসি প্রাঙ্গণে কারিগরি শিক্ষক লিডারশিপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট আধুনিকায়ন, মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দাখিল (ভোকেশনাল) কোর্স চালুকরণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, নির্বাচিত বেসরকারী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষার কলেবর বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন, যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম প্রস্তুত, সুষ্ঠু তদারকি এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে ৭,৬২৪টি এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১ম থেকে আলিম শ্রেণি পর্যন্ত কুরআন, আকাইদ ও ফিকাহ, আরবি ও হাদিস বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। বিদ্যমান সাধারণ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য মাধ্যমিকস্তর পর্যন্ত আরবি বিষয়সমূহ ব্যতীত সাধারণ আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসৃত হচ্ছে। সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক এনসিটিবিএ'র মাধ্যমে মুদ্রণ ও বিতরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, ২০১৪ সাল থেকে মাধ্যমিকস্তর পর্যন্ত আরবি ও ইসলামী বিষয়সমূহ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে যেমন কৃষি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষাসহ প্রতিযোগিতামূলক, আধুনিক ও জীবনমুখী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ও ফরম পূরণের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদিত হচ্ছে।

এছাড়া, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩২২টি মাদ্রাসার প্রত্যেকটিতে ০১টি প্রজেক্টর, ০১টি ল্যাপটপ, ০১টি ইন্টারেক্টিভ হোয়াইট বোর্ড,

০১টি স্পিকার, ০১টি ইউপিএস এবং ০১টি মোডেম সরবরাহ কার্যক্রম চলমান আছে এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনকে দ্রুত, গতিশীল এবং সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে MEMIS (Madrasha Education Management Information System) সেল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বাস্তবায়নাধীন।

উচ্চশিক্ষা

দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে সরকার বেশকিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের পুরাতন প্রায় সব জেলাতেই একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে মোট ৪২টি পাবলিক এবং ১০৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সরকারি উদ্যোগে ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে নতুন ও পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একাডেমিক ভবন, শিক্ষার্থী-শিক্ষক কর্মচারীদের আবাসিক ভবনসহ বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

'Cross Border Higher Education (CBHE)-2014' আইন পাসের মাধ্যমে বিশ্বের সেরা মানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাংলাদেশে স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। 'Higher Education Quality Enhancement (HEQEP)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সৃজনশীলতায় উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার পরিবেশ সৃজনের জন্য Academic Innovation Fund প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, দেশি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে Bangladesh Research and Education Network (BdREN) স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ছাত্র ও শিক্ষক আন্তর্জাতিক একাডেমিক কমিউনিটি এবং তথ্য ভান্ডারের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নিয়ন্ত্রণের জন্য Accreditation Council গঠনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা, প্রশাসন, অর্থ, গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি কাজের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। এ লক্ষ্যে 'হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (হেকাপ)' প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত 'Higher Education Management Information System (HEMIS)' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হেমিস পোর্টালের মাধ্যমে অন-লাইনে বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডাটা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া হেকাপ প্রকল্পের অর্থায়নে ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরি (ইউডিএল) চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ইউডিএল এর সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯২। সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকগণ ইউডিএল এর মাধ্যমে ই-বুকস ও ই-জার্নাল ব্যবহারের সুবিধা পাচ্ছেন।

শিক্ষায় আইসিটি কার্যক্রম

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষার সকল স্তরকে সম্পৃক্ত করে ICT in Education Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং আইসিটি জ্ঞান সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি কলেজে আইসিটি শিক্ষকের ২৫৫টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে আই.সি.টি. জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সহ শিক্ষাতথ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ফান্ড (E.D.C.F)-এর আওতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ব্যানবেইস কর্তৃক বাস্তবায়িত 'উপজেলা আই.সি.টি. ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন 'ইউ.আই.টি.আর.সি.ই.' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১২৫টি উপজেলায় ইউ.আই.টি.আর.সি.ই. নির্মাণ করে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ICT. ট্রেনিং ল্যাব তৈরি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে আরো ১৬০টি উপজেলায় ইউ.আই.টি.আর.সি.ই. স্থাপনের প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবমতে এ পর্যন্ত প্রায় ১,৩৮০০০ শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমকে আরো কার্যকর, আনন্দদায়ক এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে এ পর্যন্ত ৩২,৬৬৭টি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। 'এস্টাবলিশমেন্ট অব ফরেন ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টারস-২ (এফএলটিসি-২)' প্রকল্পের

অধীনে ৩১টি ডিজিটাল ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে বিদেশ গমনেচ্ছুকদের ইংরেজি, আরবি, কোরিয়ান, জাপানি, ফরাসি ভাষা শিক্ষা দিয়ে দক্ষতা সম্পন্ন জনবল হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত মোট ৩০ হাজার প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন ভাষায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

নারী শিক্ষা উন্নয়ন

নারী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি চালুর ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান, বেতন মওকুফ, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নারী শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফিও প্রদান করা হয়। তাছাড়া, মেধাবী ছাত্রীদের জন্য সাধারণ মেধাবৃত্তি এবং বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষাবৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম

স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি দেশের সকল নাগরিকের একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সরকারের গৃহীত স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সমূহের কারণে স্বাস্থ্য সেবার বিস্তার ও গুনগত মান উন্নত হয়েছে এবং সংক্রামক ব্যাধিসমূহ নিয়ন্ত্রনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কারণে জনগনের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল-ও বেড়েছে। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সূচকসমূহের প্রবণতা সারণি ১২.৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৫ঃ স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
স্থূল জন্মহার (প্রতিহাজারে)	জাতীয়	১৯.০	১৮.৯	১৮.৮	১৮.৭	১৮.৫
	শহর	১৮.২	১৭.২	১৬.৫	১৬.১	১৬.১
	গ্রাম	১৯.৩	১৯.৪	২০.৩	২০.১	২০.৪
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতিহাজারে)	জাতীয়	৫.৩	৫.২	৫.১	৫.১	৫.১
	শহর	৪.৬	৪.১	৪.৬	৪.২	৪.২
	গ্রাম	৫.৬	৫.৬	৫.৫	৫.৭	৫.৭
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৪.৩	২৪.৯	২৫.৩	২৫.২	২৫.১
	নারী	১৮.৪	১৮.৩	১৮.৪	১৮.৪	১৮.৪
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (বছরে)	জাতীয়	৭০.৪	৭০.৭	৭০.৯	৭১.৬	৭২
	পুরুষ	৬৮.৮	৬৯.১	৬৯.৪	৭০.৩	৭০.৬
	মহিলা	৭১.২	৭১.৬	৭২.০	৭২.৯	৭৩.৩
শিশু মৃত্যুহার (নবজাতক, <১বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩১	৩০	২৯	২৮	২৪
	শহর	২৬	২৬	২৮	২৮	২২
	গ্রাম	৩৪	৩১	২৯	২৮	২৫
শিশু মৃত্যুহার (৫ বছরের নিম্নে, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৪১	৩৮	৩৬	৩৫	৩১
	শহর	৩৫	৩০	৩২	৩২	২৭
	গ্রাম	৪৩	৪০	৩৯	৩৬	৩৩
মাতৃমৃত্যু অনুপাত (প্রতি হাজার জীবিত জন্ম শিশু)	জাতীয়	২.০৩	১.৯৭	১.৯৩	১.৮১	১.৭২
	শহর	১.৯০	১.৪৬	১.৮২	১.৬২	১.৫৭
	গ্রাম	২.১০	২.১১	১.৯৬	১.৯১	১.৮২
গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার (%)		৬২.২	৬২.৪	৬২.২	৬২.১	৬২.৫
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.১২	২.১১	২.১১	২.১০	২.০৫

উৎসঃ Report on Bangladesh Sample Vital Registration System-2017.

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (HPNSP)

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নীতি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 'স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSP)' শীর্ষক চতুর্থ সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো জনগণের বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস, রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার হ্রাস এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা। এ কর্মসূচির আওতায় ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কিছু কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২৯টি অপারেশনাল প্ল্যান চলমান রয়েছে।

কমিউনিটি ক্লিনিক

প্রান্তিক পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারের অনন্য উদ্যোগ কমিউনিটি ক্লিনিক সেবা কার্যক্রম। তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি ও স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো মা ও শিশু মৃত্যুর হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রার নিচে নামানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ১৯৯৮ সালে প্রথমবারের মত গ্রাম/ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে সারা দেশে ১৩,৭৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে, যার প্রতিটি প্রায় ৬,০০০-৮,০০০ জনগণকে সেবা প্রদান করছে। প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন সেবা প্রার্থী একটি কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকেন এবং এদের ৮০ শতাংশই নারী ও শিশু। ২০০৯ সাল থেকে শুরু করে আগস্ট, ২০১৮ পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো থেকে ৭৫ কোটিরও বেশী সংখ্যকবার সেবা নেয়া হয়েছে। এ সময়কালে ৩.৬৯ কোটিরও বেশী রোগীকে জরুরী প্রয়োজনে ও জটিলতার জন্য উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে রেফার করা হয়েছে। সারাদেশে প্রায় ৪,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব সেবা দেয়া হচ্ছে এবং ২০০৯ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে শুরু হওয়া এ ব্যবস্থায় ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬০,০০০ স্বাভাবিক প্রসব সম্পন্ন হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক 'কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার' (সিএইচসিপি) নিয়োগপূর্বক তাঁদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং পর্যাপ্ত ঔষধ ও পরিবার-পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে এ সকল কমিউনিটি ক্লিনিক পুরোমাত্রায় কার্যকর হয়েছে।

এছাড়া, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো বহিঃবিভাগীয় চিকিৎসা সেবা ছাড়াও স্বাস্থ্য শিক্ষা, পুষ্টি সেবা ও পুষ্টি উপাদান সরবরাহ, উচ্চতর পর্যায়ে রেফারেল সেবা প্রদান করে থাকে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

মাঠ পর্যায়ে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীর মাধ্যমে ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষা, ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত অন্ধত্ব দূরীকরণ, কৃমিনাশক ওষুধ বিতরণ ও টিকাদান ইত্যাদি কর্মসূচি জোরদার করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার এবং বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস পেয়েছে এবং গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল হিসেবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অর্থনীতিতে উৎপাদনও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বর্তমানে দেশে ডেঙ্গু, সোয়াইন ফ্লু এবং সার্স রোগগুলো দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া, শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচি, স্কুল স্বাস্থ্য কর্মসূচি,বয়:সন্ধি স্বাস্থ্য কর্মসূচি, ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হচ্ছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার 'স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদেরকে রোগমুক্ত রাখার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে ইপিআই কর্মসূচির আওতায় যে ১০টি রোগ প্রতিরোধের টিকা প্রদান করা হচ্ছে সেগুলো হলোঃ ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম, যক্ষা, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া ও রুবেলা। বর্তমানে সারা দেশে সকল প্রকার টিকা গ্রহণকারীর শিশুদের হার ৮৫শতাংশ। ইপিআই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০১৪ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করে এবং এ অবস্থান বজায় রয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কক্সবাজারের উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলায় আশ্রিত 'জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের (এফডিএমএন)' মধ্যে ডিপথেরিয়া ও হামের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলা করেছে। বিভিন্ন প্রকার টিকার (MR, bOPV, OCV, Penta, PCV, Td and vitamin A) সর্বমোট ৪৮,১৪,৫২৮টি ডোজ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ সময়কালে 'টিকা কর্মসূচির' মাধ্যমে এফডিএমএনদের দেয়া হয়। সারণি

১২.৬ এ বছরওয়ারী ইপিআই কভারেজ এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির তথ্য দেয়া হলোঃ

সারণি ১২.৬ঃ ইপিআই এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির হার

বছর	বিসিজি (%)	ওপিভি-১ (%)	ওপিভি-২ (%)	ওপিভি-৩ (%)	পেন্টা-১ (%)	পেন্টা-২ (%)	পেন্টা-৩ (%)	হাম (%)	সকল টিকা (%)
২০১১	৯৯.০	৯৯.০	৯৭.৭	৯৫.১	৯৯.০	৯৭.৬	৯০.০	৮৮.৫	৮২.৯
২০১২	৯৯.০	৯৯.০	৯৭.৭	৯৫.১	৯৯.০	৯৭.৬	৯০.০	৮৮.৫	৮২.৯
২০১৩	৯৫.০	৯৫.০	৯৪.০	৯২.০	৯১.০	৯৩.০	৯২.০	৮৬.০	৮১.০
২০১৪	৯৯.২	৯৫.১	৯৪.২	৯৪.০	৯১.০	৯৩.০	৯৩.০	৮৬.৬	৮১.৬
২০১৫	৯৯.২	৯৪	৯৪.৭	৯২.৭	৯২.৬	৯৩.৩	৮৬.৬	৮৬.৬	৮১.৬
২০১৬	৯৯.৫	৯৭.৮	৯৭.০	৯০.১	৯৭.৮	৯৭.০	৯০.১	৮৭.৫	৮২.৩
২০১৭	১০১.৩	১০০.১	৯৯.৩	৯৭.৯	১০০.১	৯৯.৯	৯৮.৫	৯৮.৮	৯৮.৮
২০১৮	১০০.৬	৯৯.৩	৯৮.২	৯৭.৭	৯৮.৭	৯৭.৩	৯৬.৬	৯৭.৬	৯৭.৬

উৎসঃ. Bangladesh EPI CES ২০১১, ২০১২, ২০১৩ , ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, DHIS2 ২০১৭, ২০১৮।

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা

মা ও শিশু স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে জরুরি প্রসূতি সেবা চালু, কমিউনিটি বেজড স্কিলড বার্থ এটেনডেন্টদের (সিএসবিএ) প্রশিক্ষণ, পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণ, নিরাপদ এমআর সেবা, বেসরকারি খাতের প্রসারে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি। এছাড়াও, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম প্রবর্তন, সার্ভিক্যাল এবং ব্রেস্ট ক্যান্সারের আগাম সনাক্তকরণ কার্যক্রম সরকার বাস্তবায়ন করছে। মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী চিকিৎসক, পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা ও অন্যান্য মাঠকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সারা দেশে সরকার বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় ব্যাপক আকারে মাতৃ, শিশু ও নবজাতক স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি (MNCH) বাস্তবায়ন করছে। জরুরি প্রসূতি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিসেফের সহায়তায় দেশের প্রতিটি জেলায় Emergency Obstretic Care (EmOC) চালু করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫৯টি জেলা হাসপাতাল, ৩টি সাধারণ হাসপাতাল, ১৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ৬৩টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে Comprehensive Emergency Obstretic Care (CEmOC) এবং অবশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে Basic Emergency Obstretic Care (BEOC) সেবা চালু আছে। EmOC সেবা সম্প্রসারণের ফলে মাতৃমৃত্যুর হার মোট প্রসবের হার ১৭০ এবং নবজাতক মৃত্যুর হার ২৮-এ নেমে এসেছে।

দুর্গম ও প্রান্তিক এলাকার গর্ভবতী মহিলাদের প্রসব পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিএসবিএ এবং মিডওয়াইফদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ১১,৫৪৪ জন সিএসবিএকে গ্রামীণ অঞ্চলে মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও, তিন বছর মেয়াদি মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে এবং প্রায় ৩,০০০ মিডওয়াইফারির পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

পুষ্টি সেবা

সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে পুষ্টি সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এইচপিএনএসপি'র আওতায় ২০১৭-২০২২ মেয়াদে 'ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এনএনএস)' শীর্ষক একটি অপারেশনাল প্ল্যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচিটির মূল লক্ষ্য অপুষ্টিজনিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পুষ্টি সেবা প্রদান; দৈহিক পুষ্টি আহরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভাস পরিবর্তন ও পুষ্টি সমৃদ্ধ জীবনপ্রণালী প্রবর্তনের জন্য সচেতনতা গড়ে তুলতে কাজ করে। এছাড়া, পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে পুষ্টি হীনতা নিয়ন্ত্রণ; সম্পূরক পুষ্টির প্রবর্তন; এবং মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি (Severe Acute Malnutrition) চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ২৫২টি মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি সেবা কেন্দ্র এবং ৩৯৫টি শিশু বয়স কালের সমন্বিত সেবা কর্নার (Integrated Management of Childhood Illness) এবং পুষ্টি কর্নার স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া, জীবন-যাপন পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া ৬৪

জেলায় পুষ্টিবিদের পদ সৃষ্টি এবং মাঠ কর্মীদের জন্য বিসিসি ই-টুলকিটের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে পুষ্টি অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে। অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের কম-ওজন, কৃশকায়তা, খর্বাকৃতি একং স্বল্প-ওজনের নবজাতকদের হার হ্রাস পেয়েছে। জন্ম গ্রহণের ১-ঘন্টার মধ্যে মাতৃদুগ্ধ পান; ৬-মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মাতৃদুগ্ধ পান; বছরে দুই বার ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন-এ ক্যাপসুল সেবন; রাতকানা রোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রের অর্জন পুষ্টি খাতের ধারাবাহিক অগ্রগতি বজায় থাকাকেই নির্দেশ করে।

অপুষ্টির ঘাটতি ও নিরাময় কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। পুষ্টি সেক্টরে অর্জিত সূচকসমূহের অগ্রগতি সারণি ১২.৭ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৭ঃ বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতি

সূচক	২০০৭ (%)	২০১১ (%)	২০১৪ (%)	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২	মন্তব্য
স্বল্প ওজনের শিশু (০-৫৯ মাস)	৪১.০	৩৬.৪	৩২.৬	২৫%	চলমান
খর্বাকৃতি (স্টান্টিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	৪৩.২	-	৩৬.১	২৫%	চলমান
কৃশকায় (ওয়াসটিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	১৭.৪	-	১৪.৩	<১০	চলমান
জন্মকালীন কম ওজনের শিশু	-	-	২২.৬	<১৮%	চলমান
জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৩	৪৭.১	৫০.৮	৬০%	চলমান
গভর্বতী রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-	এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস	চলমান
কিশোরীর রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-		চলমান
শিশুর রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-		চলমান
রাতকানা রোগের হার	-	-	০.২	<১%	চলমান
গৃহস্থলী পর্যায়ে আয়োডিন যুক্ত লবন ব্যবহারের হার	-	৮২	-	এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস	চলমান
শিশুদের শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৩	৬৪	৫৫.৩	৬৫%	চলমান
ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার (৬-৫৯ মাস)	৮৮	৬০	৯২	>৯০%	চলমান

উৎসঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্বাস্থ্যবীমা

স্বাস্থ্যখাতে বিকল্প অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্য খাতে দক্ষতা অর্জন ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩২ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (Universal Health Coverage-UHC) অর্জনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা অর্থায়ন কৌশল (২০১২-২০৩২) প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিকল্প অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারসমূহকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলার তিনটি উপজেলায় 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK)' নামে একটি পাইলট প্রকল্প শুরু হয়েছে। দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থানকারী আশি হাজারের বেশী জনগণকে এ স্কীমের সুবিধাভোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সকল জনগণকে স্বাস্থ্যকার্ড প্রদানের মাধ্যমে বিনামূল্যে উপজেলা পর্যায়ে ৭৮টি রোগের আন্ত:বিভাগীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী ৮১,২২০টি নিবন্ধনকৃত পরিবারের মধ্যে ৬,৮৫৫ এসএসকে কার্ড-হোল্ডার রোগী আন্ত:বিভাগ থেকে সর্বপ্রকার সেবা পেয়েছেন।

স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এবং ই-হেলথ কর্মসূচি

স্বাস্থ্য খাতে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এনেছে। সরকার ইতোমধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং অন্যান্য তৃণমূল পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের ল্যাপটপ এবং এন্ড্রয়েড ট্যাবলেট প্রদান করেছে। প্রত্যেক গর্ভবতী মা এবং অনুর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশুদের তথ্য তালিকাভুক্ত করার কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। প্রত্যেক নাগরিককে একটি অভিন্ন 'Health Identifier Code' প্রদান করা হচ্ছে যা স্থায়ী স্বাস্থ্য তথ্য সংরক্ষণ সফটওয়্যার তৈরিতে জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটা বেজের মাধ্যমে ব্যবহার করা হবে। জাতীয় ই-হেলথ নীতি এবং কৌশলপত্রের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজসমূহে ভর্তি কার্যক্রম, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, ডাক্তারদের ছুটি ও ডেপুটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম,

সকল ধরণের প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করা হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক উপস্থিতি রেকর্ডের পাশাপশি ডিজিটাল অফিস ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রতিটি জেলা ও উপজেলার সরকারি হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবা গ্রহীতাগণ এসএমএস -এর মাধ্যমে প্রায় ৮০০টি সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে অভিযোগ পেশ করতে কিংবা স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। ৮২টি হাসপাতাল থেকে উচ্চতর টেলি-মেডিসিন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। 'স্বাস্থ্য বাতায়ন' নামক একটি কল-সেন্টার সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে। একটি টেলিমেডিসিন সেবার পাশাপাশি 'স্কাইপভিত্তিক টেলি-কনসাল্টেশন' সেবাও চালু হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি

সরকারের নানা কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহনের ফলে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০০১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিলো ১.৫৭ শতাংশ, যা বর্তমানে ১.৩ শতাংশ। একই সাথে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হারও বেড়েছে। বর্তমানে ৬২.৪ শতাংশ দম্পতি জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করছে, অথচ ২০০১ সালে এ হার ছিল ৫৩.৮ শতাংশ। ২০১৪ সালের বিডিএইচএস প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০১ সালে মহিলা প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা বা Total Fertility Rate (TFR) ছিলো ৩.০; বর্তমানে এই হার কমে হয়েছে ২.০৫ (উৎসঃ SVRS-2017)। ২০২২ সালের মোট প্রজনন হার ২ এ নামিয়ে আনার জন্য সরকার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে, যার অন্যতম হল পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার ৬২.৪ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশে উন্নীত করা। এছাড়া, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং ইউনিয়ন পর্যায়েও সার্বক্ষণিক প্রসব সেবা প্রদানের কারণে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমেছে। বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার ৩.২ থেকে কমে হয়েছে ১.৭৬ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) এবং শিশুমৃত্যুর হার ৮৮ থেকে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৩৫ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)।

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশই কিশোর-কিশোরী। বিপুল এই জনগোষ্ঠীকে মান সম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সেবা কেন্দ্রগুলোকে কৈশোর বান্ধব করা হয়েছে। বর্তমানে ৬৪টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৩৩৭টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য কর্ণার খোলা হয়েছে।

বর্তমানে ৩,৩৬৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং ২,৮৫৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৪/৭ (অর্থাৎ সার্বক্ষণিক) জরুরি প্রসূতি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, এমএফএসটিসি মোহাম্মদপুর এবং জেলা পর্যায়ে ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। তাছাড়া, স্থানীয় চাহিদার নিরিখে ১২টি উপজেলায় এবং ২৪টি ইউনিয়ন সহ দেশব্যাপী সর্বমোট ৯৬টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা, জরুরি প্রসূতি সেবাসহ প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার স্থানীয় জনগণের চাহিদার আলোকে ইউনিয়ন পর্যায়ে আরও নতুন ১০ শয্যা বিশিষ্ট ৮৯টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWCs) নির্মাণ করেছে। পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ১০টি জেলা কার্যালয় ও ১৪৯ টি পরিবার পরিকল্পনা স্টোর সহ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকার মিরপুরের একটি মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে যা ২০১৯ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হবে।

বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে এমসিএইচটিআই আজিমপুর, এমএফটিসি মোহাম্মদপুর এবং জেলা পর্যায়ে ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। অদ্যাবধি ৩৪৭ জন চিকিৎসককে এক বছর মেয়াদি এবং ৭২২ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে ৬ মাসব্যাপী ও.টি ব্যবস্থাপনা ও নার্সিং কেয়ারের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত ১,৯৫৪ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের ধাত্রী বিদ্যায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং বর্তমানে আরও ১২১ জন প্রশিক্ষণাধীন রয়েছেন। তৃণমূল পর্যায়ে নিরাপদ প্রসব সেবা প্রদান করার জন্য ১১,২৫৭ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী ও মহিলা স্বাস্থ্য সহকারীকে সিএসবিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শহরাঞ্চলের বস্তি, চরাঞ্চল, দুর্গম এলাকা, অনগ্রসর পল্লী অঞ্চল ও হাওরাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য এলাকাভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বেসরকারি স্বাস্থ্য খাত

বহুবিধ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ সত্ত্বেও সরকারের একার পক্ষে দেশের সব মানুষের চাহিদামাফিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তাই সরকারের পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে

সরকার আর্থিক অনুদানসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। বেসরকারি খাতে নিবন্ধিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা বিশেষত স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং ডায়রিয়ার মত সংক্রামক ব্যাধি নির্মূলে এনজিওর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় এইচআইভি/এইডস, পুষ্টি এবং অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ কিছু এনজিও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে । স্বাস্থ্য খাতে সরকারি, বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ভিত্তিক বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে, স্বাস্থ্য খাতে পিপিপি'র আওতায় মোট ২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। 'চট্টগ্রাম মেডিকেলকলেজ হাসপাতালে কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন' এবং 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিস এন্ড ইউরোলজি, ঢাকায় কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন' প্রকল্প।

স্বাস্থ্য শিক্ষা

স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রসারেও সরকার বদ্ধপরিকর। বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে ও পাঠ্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির আসন সংখ্যা ১২,৬১১ এ উন্নীত করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ পর্যন্ত দেশে ৩৬ টি সরকারি মেডিকেল কলেজ (আসন ৪,০৬৮টি), ১টি আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ (আসন ১২৫) ও ৫টি আর্মি মেডিকেল কলেজ (আসন ২৫০), ৯টি ডেন্টাল কলেজ (আসন ৫৩২), ২৮টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইন্সটিটিউশন (আসন ১,৫১৮), ৯টি মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (আসন ৮১৮), ১১টি ইন্সটিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজি (আসন ২,৫৮৫) এবং ১৫টি নার্সিং কলেজ দক্ষ জনশক্তি তৈরির কাজ করছে। একই সাথে বেসরকারি খাতে মোট ৬৯টি মেডিকেল কলেজ (আসন ৬,২৩১), ২৬টি ডেন্টাল কলেজ (আসন ১,৪০৫), ২০০টি মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (আসন ১৩,৫৪০), ৯৭টি ইন্সটিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজি (আসন ৮,৯৪০) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সম্প্রতি ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে নেত্রকোনা মেডিকেল কলেজ, নীলফামারী মেডিকেল কলেজ,নওগাঁ মেডিকেল কলেজ, মাগুরা মেডিকেল কলেজ ও চাঁদপুর মেডিকেল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া, গোপালগঞ্জ ও গাজীপুর জেলায় একটি করে ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী স্থাপনের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিকল্প ধারার চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ১৯টি অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার কলেজ চালু আছে।

নার্সিং সেবা

নার্সিং শিক্ষা ও সার্ভিস কার্যক্রমকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে সেবা পরিদপ্তরকে 'নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে' উন্নীত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা প্রণয়ন, জনসংখ্যার চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্স/মিডওয়াইফ/নার্স গ্রাজুয়েট ও নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণসহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি এবং সরকার নির্দেশিত উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করাই এ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। বর্তমানে দেশের সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় প্রায় ৩৩,২৯৭ জন নার্স চাকুরিতে কর্মরত আছেন।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সার্ভিসকে অধিকতর গুণগত মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে দেশের ৪৩টি সরকারী নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে। ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্সে আসন সংখ্যা ১,৫৮০ থেকে বৃদ্ধি করে ২,৫৮০-তে উন্নীত করা হয়েছে। পুরাতন ৭টি নার্সিং ইন্সটিটিউটকে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট) নার্সিং কলেজে উন্নীত করে ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া আরও ১৫টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীতকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০১৮ সালে ৫,১০০ সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ৩,০০০ মিডওয়াইফ পদ সৃজন করা হয়েছে। দেশের বিদ্যমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১,৬০০ সিনিয়র স্টাফ নার্সকে ৬ মাস মেয়াদি পোস্ট-বেসিক এ্যাডভান্সড মিডওয়াইফারি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ১,২০০ জনকে সার্টিফাইড মিডওয়াইফ নামে বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্প ও ইউনিয়ন উপ-কেন্দ্রে পদায়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি, বিপিএসসির সুপারিশক্রমে দুই ধাপে মোট ১,১৪৮ জন মিডওয়াইফকে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, আরও ৬০০ (ছয়শত) মিডওয়াইফ নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান আছে।

স্বাস্থ্যখাতের সংস্কার

জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে এ খাতে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে

'চিকিৎসা সেবা আইন' এবং 'মানসিক স্বাস্থ্য আইন' প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকসহ অন্যান্য তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের ল্যাপটপ ও অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিটি নাগরিককে একটি সমরূপ 'স্বাস্থ্য সনাক্তকারী কোড' প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় ই-হেলথ নীতি এবং কৌশলপত্রের খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে। মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসকদের ছুটি ও প্রেষণ, বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করা হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক উপস্থিতি রেকর্ডের পাশাপাশি ডিজিটাল অফিস ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রতিটি জেলা ও উপজেলার সরকারি হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবা গ্রহীতাগণ এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রায় ৮০০টি সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে অভিযোগ পেশ করতে কিংবা স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। 'স্বাস্থ্য বাতায়ন' নামক একটি কল-সেন্টার সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে। একটি টেলিমেডিসিন সেবার পাশাপাশি 'স্কাইপভিত্তিক টেলি-কনসালটেশন' সেবাও চালু হয়েছে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম

নারীর সামগ্রিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নে 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়' বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলস্রোতধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০' প্রণয়ন এবং এর আওতায় বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি,-২০১১', 'জাতীয় শিশু নীতি-২০১১' এবং 'শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩',যৌতুক নিরোধ আইন-২০১৮, বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা-২০১৮, শিশু একাডেমি আইন-২০১৮ এবং 'ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন-২০১৪ ও বিধিমালা-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

নারীর সুরক্ষা, অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়নের পাশাপাশি নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকার নানাবিধ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তাসহ বিভিন্ন ধরনের ভাতাদি প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলের মাধ্যমে দরিদ্র মায়েদের মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি এবং উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সরকার কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা, যশোর ও রাজশাহীতে মোট ৫টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল পরিচালনা করছে। ঢাকার মিরপুর ও খিলগাও এলাকায় দুটি হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও,কর্মজীবী মহিলাদের জন্য গাজীপুরে ৬তলা বিশিষ্ট একটি হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

নির্যাতিত নারীদের আইনিসহ সকল প্রকারের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৬টি বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪র্থ পর্যায়)-প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪০টি জেলা সদর হাসপাতাল ও ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ মোট ৬০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ন্যাশনাল ট্রমা ও কাউন্সেলিং সেন্টার হতে মোট ১,৪৫১ জন এবং ন্যাশনাল হেল্প লাইন ১০৯ এর মাধ্যমে ৫৪,৫১১ জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সিল করার উদ্দেশ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। এর ফলে নারী উদ্যোক্তাদের দেশব্যাপী নারীবান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে লিঙ্গ সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হবে। শিশুদের দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশসহ সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে সরকার বহুবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দুস্থ শিশুদের মেধা বিকাশে ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মেয়ে শিশুদের জন্য আজিমপুর কেন্দ্র এবং ছেলে শিশুদের জন্য কেরানীগঞ্জ ও গাজীপুরে ৩টি কেন্দ্র এবং রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৩টি কেন্দ্রসহ মোট ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া ৬৪টি জেলায় এবং ৬টি উপজেলা শাখা সহ মোট ৭১টি কার্যালয়ে ১টি শিশু বিকাশ ও ১টি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪-৫+ বছর বয়সী শিশুদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। শিশুদেরকে অধিক হারে পাঠে মনোযোগী করে তোলার লক্ষ্যে শিশু একাডেমি থেকে

৯০০ এর অধিক শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু শ্রম ও শিশু নির্যাতন বন্ধ এবং শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা,পুষ্টি, নিরাপত্তা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের নিমিত্তে যেসকল কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-গর্ভ থেকে ৮ বছর বয়সী শিশুর বৃদ্ধি,বিকাশ,সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে সামাজিক উদ্দুদ্ধকরণ এবং প্যারেন্টিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা, হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র কার্যক্রম প্রসারণ করা, গ্রামীণ এলাকার কওমী মাদ্রাসা শিশুদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, চা বাগান ও গার্মেন্টস কর্মীদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার স্থাপন ও পরিচালনা ইত্যাদি।

সমাজকল্যাণ

দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের উপর দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করে। সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিতকরণের জন্য সরকার ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সরকারের হয়ে কাজ করছে। মন্ত্রণালয়ের আওতায় অপরাধপ্রবণ কিশোরদের সংশোধন, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন, দুঃস্থ ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের লালনপালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসন করা হচ্ছে। এছাড়াও, পরিত্যক্ত নবজাত শিশুদের লালন-পালন, ভবঘুরে পুনর্বাসন, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, নিরাপদ আবাসনসহ বহুবিধ কার্যক্রম দেশব্যাপী বাস্তবায়নাধীন আছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা/চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম, সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয় স্থাপন উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কর্মসূচি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের নিজস্ব পরিবেশে এবং স্থানীয় শিক্ষালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমন্বিত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬৪টি জেলা শহরে সমন্বিত অন্ধশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও, 'চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে পথশিশুদের 'Drop In Center' এর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এছাড়া, সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে অতি দরিদ্র শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিকল্পে কাজ করে যাচ্ছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৪৩১৬.৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা উক্ত বাজেট বরাদ্দের ১.০৭ শতাংশ এবং জিডিপি বরদ্দের ০.১৯ শতাংশ।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হিসেবে বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচি, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি, বিভিন্ন ধরনের ভাতা প্রদান কর্মসূচি, খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, এতিমদের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি, পুনর্বাসন কর্মসূচি ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের চরিত্র সংশোধনপূর্বক সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পিতামাতার অবাধ্য সন্তানদের সংশোধনকল্পে ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র এবং ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন ০-৭ বছর বয়সী পরিত্যাক্ত শিশুদের মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য দেশের ৬টি জেলায় ৬টি ছোটমণি নিবাস চালু রয়েছে। ৬-১৮ বছর বয়সের দুস্থ শিশুদের সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করার উদ্দেশ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এছাড়াও, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অধীনে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, অটিজম রিসোর্স সেন্টার, অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল, প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণসহ প্রতিবন্ধী ও অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

যুব ও ক্রীড়া

যুব উন্নয়ন

যুবসমাজকে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান দানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দেশের শিক্ষিত

বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে 'ন্যাশনাল সার্ভিস' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির নীতিমালা অনুযায়ী মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক/যুব-মহিলাদের জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে অস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে কাজ করছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবকদের ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার বেসিক কোর্স ও গ্রাফিক ডিজাইন ও ভিডিও সম্পাদনা কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৫৬,৬৩,৯৮৮ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে একই সময়ে ২১,৬৬,৬৭৬ জন যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। প্রশিক্ষিত যুবদের প্রকল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির আওতায় জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ০৯ লক্ষ ২৪ হাজার ০৪ শত ০৯ জন উপকারভোগীকে মূল ও ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হতে ১৮০৩ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশালা, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুবকেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। এটি মূলত একটি মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র। একই উদ্দেশ্যে বগুড়ায় আঞ্চলিক যুবকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

ক্রীড়া উন্নয়ন

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করতে জাতীয় ক্রীড়া পরিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহের ছেলে-মেয়েদের ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়মিতভাবে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন করে ক্রীড়া প্রতিভা নিরূপণ ও ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশেও কাজ করছে জাতীয় ক্রীড়া পরিদপ্তর। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরি, ক্রীড়াক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ, মাদকের অপব্যবহার রোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতেও ক্রীড়া পরিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবের খেলাধুলা আয়োজন ও পরিচালনার জন্য বিনামূল্যে ক্রীড়া সরঞ্জামাদি প্রদান করা হচ্ছে। ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে স্নাতক ডিগ্রীধারী যুবক ও যুব মহিলাদের ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

একটি জাতির ইতিহাস, সভ্যতা এবং জাতীয় চরিত্র ও পরিচিতি সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রসার ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ১৭টি দপ্তর/সংস্থা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং এর মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র এবং সৃজনশীল প্রকাশনাসহ সুকুমার শিল্পের সকল শাখার উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে।

দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ও নিদর্শনসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থাপনার সংস্কার, সংরক্ষণ, জরিপ ও উৎখননের কাজ চলছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত যশোর জেলার ভরত ভায়না ঢিবিকে পর্যটক বান্ধব, হাজী মুহাম্মদ মহসীনের ইমানবাড়া ও চুয়াডাঙ্গা জেলার কালুরপোল রাজার ভিটায় প্রদর্শনী কেন্দ্র, নীলফামারী জেলার প্রাচীন বিন্নাদিঘী ও অন্যান্য প্রত্নস্থান সংলগ্ন স্থানে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ২৬টি প্রত্নস্থল/জাদুঘরের প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার, সংরক্ষণ, মেরামত ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৫টি প্রত্নস্থলের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং নরসিংদী জেলায় উৎখনন পরবর্তী একটি জাদুঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশে পর্যটক আকর্ষনীয় ১৭টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষনার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনে বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষনা ও প্রকাশনার কাজ পরিচালনা করে থাকে এবং প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে অমর একুশে গ্রন্থমালা আয়োজনসহ বিভিন্ন দিবস উৎযাপন করে থাকে। এছাড়া

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রসার ও উৎসাহ প্রদানের কাজ করছে। বর্তমানে ৬৪ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সিলেবাসভিত্তিক কণ্ঠসংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা, চারুকলা ও তালযন্ত্র বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র গ্রন্থাগারের পাঠকদের চাহিদা মোতাবেক পুস্তক ও পাঠসামগ্রী সংগ্রহ এবং সরবরাহ করা, অনলাইনে পড়ার সুযোগ সম্বলিত ই-বুক, সাময়িকী, জার্নাল এবং বিভিন্ন পাঠসামগ্রী পাঠকদের নিকট পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের প্রায় ৫৫টি বেসরকারি গ্রন্থাগারকে তালিকাভুক্তি সনদপত্র প্রদান এবং ৬৭৬টি বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে অনুদানের বই সরবরাহ করা হয়েছে।বর্তমানে এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৭১টি সরকারি লাইব্রেরি পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের শিল্প-সাহিত্য নিয়ে নজরুল ইনস্টিটিউট কাজ করছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত নজরুল ইনস্টিটিউট মোট ৩৭টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশ সরকার পাহাড়ি এলাকার প্রান্তিক সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তিনটি পাহাড়ি জেলায় মোট ৯৮৯.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২,২১৬টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পাহাড়ী জনগণের উন্নয়ন এবং তাদের গৌরবময় সংস্কৃতি অক্ষুন্ন করার জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং কারিগরী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

সম্প্রচার কার্যক্রম

তথ্য মন্ত্রণালয় সরকারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ন প্রচার সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ সার্বিক কর্মকান্ডের তথ্য সরকারের শীর্ষ পর্যায়সহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়ায় এ মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরণ করা হয়। গণমাধ্যমের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত) ৫২৭.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭টি প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। এ সমস্ত প্রকল্প/কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উৎকর্ষতার সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বব্যাপি গণমাধ্যমসহ যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং এর যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে সেই অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।